ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস

(সংক্ষিপ্ত রূপরেখা)

৭ম পাঠচক্রের নোট

নভেম্বর-২০১৯

অক্টোবর, ২০১৯

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস
(সংক্ষিপ্ত রূপরেখা)

সূচনা পর্ব

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন ১০০ বছর হতে চললো। ১৯২০ সাল থেকে বর্তমান ২০১৯ সাল পর্যন্ত। শ্রেণিশোষণ থেকে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং সেই শোষণহীন সমাজকে শ্রেণিহীন শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যে-কোনো কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-ও সেই লক্ষ্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করে চলেছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নানা ঝড়-ঝাপটা, ঘাত-প্রতিঘাত, নির্যাতন-নিপীড়নের মধ্য দিয়ে মানবসমাজের মুক্তির জন্য এগোতে হয়, ভারতেও কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। তাই এ ইতিহাস আত্মত্যাগের, এ ইতিহাস গর্বের, এ ইতিহাস আত্মবিশ্বাসের।

ভারতের অনেক বিপ্লবী তখন দেশের ভেতরে তো বটেই, দেশের বাইরে বিশ্বের নানা দেশ থেকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশের মুক্তির জন্য কাজ করছিলেন। কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষ হবার পর কমিনটার্নের উদ্যোগে প্রবাসে কমিউনিস্ট ও সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ও সংগঠকদের সমবেত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই সময়ে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হয়। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়াতে কেবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয় না, ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন জোরদার করতে, দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার প্রেরণা যোগাতে লেনিনের উদ্যোগে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক (কমিনটার্ন) স্থাপিত হয় ১৯১৯ সালে। এই পটভূমিকায় ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর মানবেন্দ্রনাথ রায় (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)-এর সক্রিয়তায় সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দ শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠার সময় পার্টির সভ্য হন ৭ জন–১) মানবেন্দ্রনাথ রায়, ২) এভেলিন ট্রেন্ট রায়, ৩) অবনী মুখার্জি, ৪) রোজা ফিটিংহফ, ৫) মুহম্মদ আলি (আহমদ হাসান), ৬) মুহম্মদ শফিক সিদ্দিকী, ৭) এম বি টি আচার্য বা এম প্রতিবাদী আচার্য। পার্টির সম্পাদক হন মুহম্মদ শফিক সিদ্দিকী। কমিনটার্ন (১৯১৯-৪৩) নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করার এবং ভারতের পরিস্থিতির উপযোগী একটি কর্মসূচি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয় পার্টি তার প্রতিষ্ঠা সভায়। কমিনটার্ন ১৯২১ সালে সিপিআই-কে কমিউনিস্ট গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯২১-

২২ সাল থেকে দেশে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, কানপুর শহরকে কেন্দ্র করে পার্টি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, এস এ ডাঙ্গে, সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার, গোলাম হুসেন প্রমুখ নেতারা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমশ একটা মূল ধারা হয়ে ওঠে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা। আগেই আরও দু'টো মূল ধারা সৃষ্টি রয়েছে– ১) জাতীয় বিপ্লববাদী আন্দোলনের ধারা, ২) অসহযোগ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ধারা।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করে আসে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৩৬তম অধিবেশন হয় আমেদাবাদে ১৯২১ সালে ও ৩৭তম অধিবেশন হয় গয়ায় ১৯২২ সালে। এই অধিবেশনগুলোকে কেন্দ্র করে সিপিআই-এর পক্ষ থেকে প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য ইশ্‌তেহার প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন মৌলানা হসরত মোহানি, যিনি ১৯২৫ সালে কানপুরে সিপিআই-এর সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। প্রস্তাব সমর্থন করেন কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন স্বামী কুমারানন্দ। কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে আবার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলেন এম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার, যিনি ১৯২৫ সালে পার্টির কানপুর সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। উল্লেখ্য, ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয় ১৯২৩ সালে মাদ্রাজের সমুদ্র সৈকতে সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের সভাপতিত্বে তাঁর মেয়ের লাল কাপড়কে লাল পতাকা করে নিয়ে।

কমিনটার্নের পক্ষ থেকে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলায় সাহায্য করত গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি। ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি সে সাহায্য করেছে, এমনকি ব্রিটেনের পার্টির নেতা ফিলিপ স্প্রাট ও বেঞ্জামিন ফ্রান্সিস ব্রাডলি (ব্রেন ব্রাডলি) মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় কারারুদ্ধ হয়েছেন। ব্রিটেনের পার্টির দুই নেতা রজনী পাম দত্ত ও ব্রেন ব্রাডলি ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণফ্রন্ট গড়ে তোলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে ১৯৩৬ সালে এক দলিল উপস্থিত করেন, যা 'দত্ত-ব্রাডলি থিসিস' নামে পরিচিত।

আন্দোলনের বিকাশ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম থেকেই ব্রিটিশ শাসকদের কাছে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ফলে ১৯২১ সাল থেকেই পার্টির ওপর আক্রমণ নেমে আসে। ১৯২১-২৭ সালে পাঁচটা পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২৩-২৪ সালে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২৯-৩৩ সালে মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা চলে। সবকটাই সাজানো মামলা। এখানে এটা উল্লেখ করতে হয় যে পরাধীন ভারতে ১৯৩৪-৪২ সালে এবং স্বাধীন ভারতে ১৯৪৮-৫১ সালে পার্টি নিষিদ্ধ থাকে।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির, বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন অংশের মানুষকে তাদের নিজ নিজ দাবি এবং সেই সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার দাবিতে শামিল করার জন্য সিপিআই নানা শ্রেণি ও গণসংগঠন গড়ে তুলতে বা পরিচালনা করতে থাকে। অবশ্য কোনো কোনো সংগঠন স্থাপনে প্রাথমিক পর্যায়ে সিপিআই-এর ভূমিকা ছিল না। ১৯২০ সালে স্থাপিত হয় অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ১৯৩৬ সালে সারা ভারত কৃষকসভা, ১৯৩৬ সালে

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন, ১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ, ১৯৪৩ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ।

উনিশ শতকের চারের দশকে গোটা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। ত্রিপুরায় রিয়াং বিদ্রোহ (১৯৪২), মালাবারে কায়ুর বিক্ষোভ (১৯৪৩), মহারাষ্ট্রে ওয়ারলি আদিবাসী অভ্যুত্থান (১৯৪৫-৪৬), ময়মনসিংহের হাজং বিদ্রোহ (১৯৪৫-৪৭), ত্রিবাঙ্কুরের পুন্নপ্রা-ভায়ালার বিদ্রোহ (১৯৪৬), বাংলার তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭)-এর মধ্য দিয়ে কৃষকেরা যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে, সেই তরঙ্গকে বোম্বাই, করাচি, কোচিন, কলকাতা, বিশাখাপত্তনম ইত্যাদি বন্দরগুলোতে নৌ বিদ্রোহ (১৯৪৬) সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জলোচ্ছ্বাসে পরিণত করে। নৌ সেনাদের সমর্থনে শ্রমিকশ্রেণি এগিয়ে আসে, তার সঙ্গে যুক্ত হয় সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষ, বোম্বাইয়ে বৃহত্তম ধর্মঘট ও হরতাল সংগঠিত হয়। বোম্বাই ও তার শহরতলিতে ৩ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। পুলিশের বেপরোয়া গুলি চালনায় সরকারি মতে ২২৮ জন, বেসরকারি মতে প্রায় ৫০০ জন মানুষের মৃত্যু হয়। এরই মাঝখানে আইএনএ বন্দিদের মুক্তির দাবিতে ১৯৪৫ সালে কলকাতায় ছাত্র-যুব বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে নিহত হন রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও আব্দুস সালাম। ১৯৪৬ সালে সারা দেশে ডাক-তার-টেলিকম কর্মীদের ধর্মঘট এবং সেই ধর্মঘটের সমর্থনে সাধারণ ধর্মঘট হয়, আইএনএ ক্যাপ্টেন রসিদ আলির মুক্তির দাবিতে কলকাতা, বোম্বাই সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৪৬-৫১ সালে পরিচালিত হয় তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রাম। বীরত্বপূর্ণ এই গণ অভ্যুত্থানে ৪ হাজার (কোনো কোনো অনুসন্ধানকারীর মতে ৬ হাজার) মানুষ নিহত হন, ১০ হাজারের বেশি মানুষ জেল ও বন্দিশিবিরে আটক থাকেন, অন্তত ৫০ হাজার মানুষ দিনের পর দিন পুলিশ ও সেনা শিবিরে নিগৃহীত হন।

১৯৪৭ সালে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের পরও পণ্ডিচেরী, গোয়া ও দেশের আরও কিছু অংশ ঔপনিবেশিক শাসনে ছিল। ১৯৫৪ সালে ফরাসিদের কবল থেকে পণ্ডিচেরী ও অন্যান্য অংশ মুক্ত করায় এবং ১৯৫৫ সালে পর্তুগীজদের কবল থেকে গোয়া ও অন্যান্য অংশ মুক্ত করায় কমিউনিস্টদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। গোয়া মুক্তির জন্য ৩৫ জন দেশপ্রেমিক শহিদ হন, যাঁদের মধ্যে ২৭ জন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা

দেশের স্বাধীনতা এবং সেই সঙ্গে দেশের মানুষের মুক্তির জন্য ১৯৩০ সালে পার্টি 'ড্রাফট প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন' নামে একটা দলিল হাজির করে। ভারতীয় জনসাধারণের সমস্ত অংশের সমস্যাবলী উপলব্ধি করে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটাতে একটা সর্বাঙ্গীন কর্মপন্থা স্থির করা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

বিশ শতকে দুই ও তিনের দশকে ফ্যাসিবাদ ক্রমশ সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় বিপদ হিসাবে হাজির হয়। তাই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে যুক্ত করা জরুরি হয়ে পড়ে। ১৯৩৫ সালে কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেস নির্দেশ দেয় যে, ''ভারতবর্ষে কমিউনিস্টদের সবরকম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-

আন্দোলনকে সমর্থন করতে হবে, তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং তাকে ব্যাপকতর করতে হবে। যেসব আন্দোলন জাতীয় সংস্কারবাদী নেতাদের অধীনে রয়েছে সেগুলিকেও বাদ দেওয়া চলবে না। তাঁদের নিজেদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক স্বাধীনতা বজায় রেখে যে সমস্ত সংগঠনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অংশগ্রহণ করে সেগুলির মধ্যে তাঁদের সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জনসাধারণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য এই কাজের মধ্য দিয়েই সেখানে একটা জাতীয় বিপ্লবী অংশকে দানা বাঁধার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করতে হবে।'' (শ্রমিক ঐক্য ফ্যাসিবাদ বিরোধী দুর্গ – জর্জি ডিমিট্রভ)

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এই অবস্থান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন আমাদের দেশসহ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে একে একে শতাধিক দেশের মুক্তির মধ্য দিয়ে সঠিক হয়ে উঠেছে।

পার্টির মর্যাদা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই ভিন্ন ধারার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ক্রমশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। জাতীয় বিপ্লববাদী আন্দোলনে যাঁরা ছিলেন, গদর পার্টির যাঁরা নেতা ছিলেন, ভগৎ সিংয়ের যাঁরা সহকর্মী ছিলেন, সূর্য সেনের যাঁরা সহযোদ্ধা ছিলেন, সুভাষচন্দ্র বসুর যাঁরা ঘনিষ্ঠ ছিলেন, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁরা অনেকেই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন পৃথ্বী সিং আজাদ, বাবা সোহন সিং ভাকনা, আমীর হায়দার খান, নানা পাতিল, ঝাড়খণ্ড রাই, সরযূ পাণ্ডে, অরুণা আসফ আলী, প্রমোদ সেনগুপ্ত, লক্ষ্মী সায়গল (স্বামীনাথন), অজয় ঘোষ, সোহন সিং যোশ, ইরাবত সিং, কল্পনা যোশী (দত্ত), শিব ভারমা, গণেশ ঘোষ, সুবোধ চৌধুরী, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখ।

স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলোতে আন্দামানের সেলুলার, রাজপুতানার দেউলি, বাংলার প্রেসিডেন্সি ইত্যাদি দেশের নানা জেল ও বন্দি শিবিরগুলোতে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা 'কমিউনিস্ট কনসলিডেশন' গড়ে তোলেন, বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে অনেকেই পরবর্তীকালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নেতৃত্ব দেন। এইভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছেন বাংলায় প্রমোদ দাশগুপ্ত, সতীশ পাকড়াশী, নারায়ণ রায়, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সুধাংশু দাশগুপ্ত, বিজয় মোদক, সুকুমার সেনগুপ্ত, ভূপাল পান্ডা, সত্যব্রত সেন, অমৃতেন্দু মুখার্জি প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ঔপনিবেশিক ভারতে প্রতি বছর সিপিআই-এর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নেতাকে জেলে থাকতে হতো। ১৯৪৩ সালের ২৩মে – ১ জুন বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত পার্টির প্রথম কংগ্রেসে যাঁরা প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁদের ৭০ শতাংশ এক বা একাধিকবার জেলে ছিলেন এবং প্রতিনিধিদের জেলে থাকার মোট মেয়াদ দাঁড়ায় ৪১১ বছর। ১৯৪৮ সালের ২৮

ফেব্রুয়ারি–৬ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মোটা কারাজীবন হিসাব করলে প্রত্যেকের জেলে থাকার গড় দাঁড়ায় আড়াই বছর।

মতাদর্শগত সংগ্রাম

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে ১৯৫৭ সালে ও ১৯৬০ সালে দুটো দলিল গৃহীত হয়। প্রথমটা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর প্রতিনিধিদের ঘোষণা (বার পার্টির দলিল) এবং দ্বিতীয়টা একাশিটা কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর বিবৃতি (একাশি পার্টির দলিল) নামে পরিচিত। কিন্তু এইসব দলিলের পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা হতে থাকে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় আরও কিছু বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মত পার্থক্য। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, অপরদিকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৬৩-৬৪ সালে এই বিতর্ক হয়ে দাঁড়ায় মতাদর্শগত মহাবিতর্ক। এর প্রতিক্রিয়া ঘটে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে।

১৯৫৯ সালে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ ১৯৬২ সালে সীমান্ত সংঘর্ষের চেহারা নেয়। দেশের মানুষকে উগ্র জাতীয়তাবাদে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে এর প্রভাব পড়ে। ১৯৬২ সালেই আবার পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষের জীবনাবসান হয়। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। শান্তিপূর্ণভাবে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধী মীমাংসার পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য পার্টির একাংশ আক্রান্ত হন। বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হন। জাতীয় মহাফেজখানায় ব্রিটিশ আমলে ডাঙ্গের কিছু চিঠি নিয়েও বিতর্ক ওঠে। শেষপর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে ৩২ জন জাতীয় পরিষদের সদস্য ১৯৬৪ সালের ১২ এপ্রিল পরিষদের সভা ত্যাগ করেন।

সিপিআই(এম)-এর আত্মপ্রকাশ

গৌণ কারণ একাধিক আছে। কিন্তু যে কারণে এইসব জাতীয় পরিষদের সদস্যসহ পার্টির একটা বড় অংশ নতুনভাবে পার্টি গঠনের দিকে এগিয়ে যান, তা হচ্ছে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে পার্টিতে আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম। ১৯৬৪ সালের ৭-১০ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের তেনালীতে এক কনভেনশন হয়। এই কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর (পূর্ব নির্ধারিত ২৪-৩১ অক্টোবরের পরিবর্তে) কলকাতায় পার্টির সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন ভোরবেলাতে কুখ্যাত ভারতরক্ষা আইনে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিনয় চৌধুরী, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, সমর মুখার্জি, নীরেন ঘোষ, কৃষ্ণপদ ঘোষ, নরেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের আসল উদ্দেশ্য ছিল পার্টি কংগ্রেসকে বানচাল করে দেওয়া। বানচাল তো দূরের কথা, বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কংগ্রেস সফল হয়। পি সুন্দরাইয়া সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ৯ জন সদস্য নিয়ে পলিট ব্যুরো–সুন্দরাইয়া, বাসবপুন্নাইয়া, নাম্বুদিরিপাদ, এ কে গোপালন, প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু, হরকিষাণ সিং সুরজিৎ, রণদিভে, পি রামমূর্তি। কিন্তু ১৯৬৫ সালে কেরালা বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার

সময় 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' নাম ব্যবহারে ভারতের নির্বাচন কমিশনের আপত্তিতে পার্টির নাম স্থির করা হয় 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' (মার্কসবাদী) এবং নির্বাচনী প্রতীক হয় কাস্তে, হাতুড়ি ও তারা। নির্বাচনে আমাদের পার্টিই সবচেয়ে বেশি আসন পায়।

১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দেশে এক উগ্র জাতীয়তাবাদের পরিবেশ তৈরি করা হয়। অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংশোধনবাদ-বিরোধী অংশের বিরুদ্ধে এবং পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র বিরুদ্ধে আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়। সেই পরিস্থিতিতে ১৯৬৫ সালে কেরালা বিধানসভা নির্বাচন। নতুন নাম ও নতুন প্রতীক নিয়ে সিপিআই(এম)-এর প্রাপ্ত আসন ১৩৩টার মধ্যে ৩ জন সমর্থিতসহ ৪৩ জন, দলগতভাবে সর্বাধিক। নির্বাচিত ৪০ জন পার্টি প্রার্থীর মধ্যে ২৯ জন ছিলেন জেলে।

কমিউনিস্ট পার্টি একটা বিপ্লবী পার্টি। শ্রমিকশ্রেণির অগ্রণী বাহিনীর পার্টি। পার্টির একটা গঠনতন্ত্র আছে। এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো আছে। পার্টির কাজের নিয়মিত পর্যালোচনা হয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সর্বস্তরে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন হচ্ছে পার্টি কংগ্রেস। ১৯২০-২০১৯ সালে অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও পরবর্তী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র ২২টা কংগ্রেস হয়ে গেছে। পার্টির সর্বশেষ দ্বাবিংশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০১৮ সালের ১৮-২২ এপ্রিল হায়দরাবাদে। এই কংগ্রেসের আহ্বান হচ্ছে–১) স্বৈরতান্ত্রিক সাম্প্রদায়িক বিজেপি রাজত্বের অপসারণে সংগ্রাম করতে হবে। ২) গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যেতে শক্তিশালী সিপিআই(এম) গড়ে তুলতে হবে। ৩) বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ে তুলতে শক্তিশালী বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে।

পার্টি কর্মসূচি

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বড় দুর্বলতা ছিল দীর্ঘকাল কমিউনিস্ট পার্টির কোনো কর্মসূচি না থাকা। 'ড্রাফ্ট প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন' নামে কর্মসূচির একটা খসড়া তৈরি হয় ১৯৩০ সালে। কিন্তু সেই খসড়া চূড়ান্ত হয়নি। ১৯৫১ সালে কর্মসূচি গ্রহণ করলেও ১৯৫৬ সালের মধ্যে তা অকার্যকর হয়ে যায়। ১৯৬৪ সালে সেই দুর্বলতা কাটিয়ে তোলা হয়। পার্টি প্রথম একটা যথার্থ কর্মসূচি গ্রহণ করে, যাকে ২০০০ সালে সময়োপযোগী করে, কিন্তু কর্মসূচির মর্মবস্তু অপরিবর্তিত থাকে।

এই কর্মসূচি অনুযায়ী, ''বর্তমান ভারত রাষ্ট্র বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে বুর্জোয়া ও জমিদারদের শ্রেণিশাসনের যন্ত্র, ধনতান্ত্রিক পথে বিকাশের লক্ষ্যে যারা ক্রমেই বেশি বেশি করে আন্তর্জাতিক ফিন্যান্স পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। দেশের জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও কার্যাবলী এই শ্রেণিচরিত্রের দ্বারাই নির্ধারিত হয়।'' (ধারা-৫.১) রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করে পার্টি কর্মসূচি নির্দিষ্ট করে যে, ''বিকাশের বর্তমান স্তরে আমাদের বিপ্লবের প্রকৃতি মূলত সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একচেটিয়া-বিরোধী ও

গণতান্ত্রিক। আমাদের বিপ্লবের স্তর এই বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার সংগ্রামে বিভিন্ন শ্রেণির ভূমিকাকেও নির্ধারণ করে দেয়। বর্তমান যুগে সমাজতন্ত্র অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবার আবশ্যিক সোপান হিসেবে শ্রমিকশ্রেণিকেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব করতে হবে। তাই এটা বুর্জোয়াশ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত পুরনো ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। এ হচ্ছে নতুন ধরনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব যা সংগঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে।'' (ধারা-৭.২) পার্টি কর্মসূচি পার্টির রণনীতিগত দলিল। এই রণনীতিকে সফল করে তোলার জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী পার্টি তার রণকৌশল স্থির করে। পার্টির এই রণকৌশলগত দলিল হচ্ছে পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাব। পার্টির রণনীতিগত শক্তি–জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, রণকৌশলগত শক্তি–বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট।

১৯৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়, কেন্দ্রে মোরারজী দেশাই-এর প্রধানমন্ত্রীত্বে প্রথম অ-কংগ্রেসী জনতা পার্টির সরকার হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৭৮ সালে পার্টির দশম কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাব খুবই স্পষ্ট করে উল্লেখ করে, ''যে পরিস্থিতিতে জনগণ কেবলমাত্র দুটি বুর্জোয়া-জমিদার দলের মধ্যে বাছাই করতে পারেন এবং বর্তমান ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে বন্দী হয়ে যান, তার অবসান ঘটানো। আরও অগ্রগতির জন্য সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে একত্রিত করে পার্টি এই শক্তিগুলিকে সংহত করার কাজটা শুরু করেছে, যা ভবিষ্যতে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে জনগণতন্ত্রের জন্য মৈত্রীবন্ধনকে রূপ দিতে অংশগ্রহণ করবে। বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে শুধু নির্বাচন বা মন্ত্রিত্বের জন্য মৈত্রী বলে বুঝলে চলবে না, এটা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আশু অগ্রগতির এবং যে সকল প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণি অর্থনীতিকে কব্জা করে বসে আছে, তাদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য শক্তিগুলির একটি সংগ্রামী 'মৈত্রীজোট'।'' (বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট)

মতাদর্শগত অবস্থান

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ২০১৯ সাল পর্যন্ত পার্টি কর্মসূচি, সেই কর্মসূচিকে সময়োপযোগী করা ছাড়াও ১৯৬৮, ১৯৯২ ও ২০১২ সালে তিনটে মতাদর্শগত দলিল গ্রহণ করেছে।

১৯৬৮ সালের ৫-১২ এপ্রিল বর্ধমানে অনুষ্ঠিত প্লেনামে পার্টি 'আদর্শগত প্রস্তাব' গ্রহণ করে। এই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি স্বীকৃতি দিয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে আর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন করেছিল সিপিআই(এম)-এর ভেতরেই ছোট একটা গোষ্ঠীকে যাঁরা ১৯৬৪ সালে পার্টি কর্মসূচি সমর্থন করেছিলেন, আবার ৩ বছর যেতে না যেতে কর্মসূচির বিরোধিতা করে সংশোধনবাদী বিচ্যুতির বিপরীতে সঙ্কীর্ণতাবাদী বিচ্যুতি ঘটাতে চান। কিন্তু আমাদের পার্টি বিশ্বের দুই বৃহৎ কমিউনিস্ট পার্টিকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে বিতর্কিত প্রশ্নগুলোতে স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করে।

১৯৯১ সালে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ে, সমাজতান্ত্রিক শিবির অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বের অনেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বর্জন করে কিংবা পার্টির নাম বদল করে কিংবা পার্টিরই অবলুপ্তি ঘটায়। সেই

সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ১৯৯২ সালে চতুর্দশ কংগ্রেসে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে সোভিয়েত বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করে। 'কয়েকটি মতাদর্শগত বিষয় প্রসঙ্গে' প্রস্তাবে সবিস্তারে কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্র অনুযায়ী কাজ করার ক্ষেত্রে বিকৃতি, সমাজতন্ত্র নির্মাণের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব, অর্থনৈতিক পরিচালন ব্যবস্থায় সময়মতো পরিবর্তন আনতে না পারা, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ও গভীর করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, আমলাতান্ত্রিকতার বৃদ্ধি, বিপ্লবী নৈতিকতার মানের অবনতি, মতাদর্শগত ক্ষেত্রে গুরুতর বিচ্যুতি পার্টি ও রাষ্ট্র থেকে জনগণের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিভূমি রচনা করে। এর ফলে দেশের ভেতরের প্রতিবিপ্লবী শক্তি এবং দেশের বাইরের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সম্মিলিতভাবে সমাজতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করার তৎপরতা চালিয়ে যেতে পেরেছে। তবে এই বিপর্যয় নিয়ে আরও অনুসন্ধানের, আরও গভীর চর্চার প্রয়োজন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার একটা পর্যায়ে বর্তমান বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রের রূপান্তর ঘটাতে চাইছে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। কিন্তু একুশ শতকের পরিস্থিতিকে তো বুঝতে হবে এবং সেটা বুঝতে হবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে তবে মার্কসবাদকে গুরুবাক্য হিসাবে নয়, চলার পথনির্দেশক হিসাবে গ্রহণ করে। ২০১২ সালে ২০তম কংগ্রেসের 'কয়েকটি মতাদর্শগত বিষয় সম্পর্কে' প্রস্তাবে সেই কাজই পার্টি করেছে। তাই দলিলে ঘোষিত হয়েছে, ''পার্টির বিকাশ, বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈপ্লবিক উপাদান দৃঢ়তার সঙ্গে ঊর্ধ্বে তুলে রাখার অভিজ্ঞতা, বিংশ শতাব্দীতে মানবসভ্যতার বিকাশে অনপনেয় প্রভাব রেখে যাওয়া সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা এবং সমসাময়িক ধনতন্ত্র ও আজকের বিশ্বের সমাজতন্ত্রের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের ওপর দাঁড়িয়ে সিপিআই(এম) ভারতীয় জনগণের চূড়ান্ত মুক্তি পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। আমাদের জনগণের মধ্যে বর্তমানে শ্রেণিশক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৈপ্লবিক অভিযান পরিচালনা করতে এবং তারই ভিত্তিতে মানব মুক্তির একমাত্র ভিত্তি সমাজতন্ত্র স্থাপন করতে সিপিআই(এম) তার বিপ্লবী কর্তব্য পালন করবে এবং ভারতের সমস্ত শোষিত মানুষকে সমবেত করবে।'' (অনুচ্ছেদ ১১.৩)

সাফল্য-অসাফল্য

কমিউনিস্ট পার্টিকে শাসকশ্রেণির আক্রমণ, রাষ্ট্রযন্ত্রের দমন-পীড়নের মোকাবিলা করেই কাজ করতে হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। লাঠি-গুলি, মিথ্যা মামলা, জেল-জরিমানা, খুন-খারাপি, বেআইনী ঘোষণা সমানে চলেছে। তার মাঝেই অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করেছে। পরবর্তীকালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) কাজ করছে।

পরাধীন ভারতে ১৯৩৪-৪২ সালে এবং স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের বড় অংশে ১৯৪৮-৫১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী থাকে। ১৯৪৯ সালে দমদম

সেন্ট্রাল জেলে তিন কমিউনিস্ট বন্দী প্রভাত কুণ্ডু (পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য), সুমথ চক্রবর্তী, মুকুল চক্রবর্তী পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

দেশদ্রোহিতার কুৎসা সমানে চলেছে। এমনকি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতে লুট চালানোর সময় কমিউনিস্টদের রুশ ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে অভিযুক্ত করে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম থেকেই ব্রিটিশ শাসকদের কাছে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ফলে ১৯২১ সাল থেকেই পার্টির ওপর আক্রমণ নেমে আসে। ১৯২১-২৭ সালে পাঁচটা পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২৩-২৪ সালে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২৯-৩৩ সালে মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা চলে। সবকটাই সাজানো মামলা। মীরাট মামলায় অভিযুক্তরা যে সব বিবৃতি দেন, তাতে কমিউনিস্ট পার্টির বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮ জন কমিউনিস্ট বন্দী তাঁদের সাধারণ বিবৃতিতে ঘোষণা করেন, ''আমরা অনুকম্পা চাইছি না, এমনকি এই কোর্টের কাছে ন্যায় বিচারের জন্য সওয়াল করছি না। এটা একটা শ্রেণির কোর্ট। শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে এখানে ন্যায় বিচারের ধারণা অর্থহীন। আমরা জানি এই কোর্ট আমাদের ন্যায় বিচার দিতে পারবে না। কিন্তু তাই বলে সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুরতার কাছে আমরা নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে নিজেদের সঁপে দিতে পারি না। আমাদের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে গোটা সাম্রাজ্যের নিপীড়িত শ্রেণি ও জনগণকে যাতে প্ররোচিত করার সাহস দেখাতে না পারে তার জন্য সাম্রাজ্যবাদকে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি।'' (কাঠগড়া থেকে কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ জানান) কমিউনিস্টদের কাছে স্বাধীনতার তাৎপর্য কতটা গভীর, তাও এই কমিউনিস্ট আসামীদের বক্তব্যে ফুটে ওঠে।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুতিও ঘটেছে। ফলে পার্টি কখনও কখনও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এইসব বিচ্যুতিকে সংশোধনবাদী কিংবা সঙ্কীর্ণতাবাদী বিচ্যুতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি কাটিয়ে অবশ্য কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১৯৪১ সালে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হলে পার্টি তখন সেই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ হিসাবে চিহ্নিতকরণ করে এবং চিহ্নিতকরণ ছিল সঠিক, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি এবং পরবর্তী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি থেকে প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৪২ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেয় এবং মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই ডাকে সাড়া দেয়। সিপিআই জনযুদ্ধের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্পর্ক নির্ধারণ করলেও ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে পার্টির কর্তব্যকে সংযুক্ত করতে পারেনি এবং এটা পার্টির পক্ষে একটা বড় ধরনের ভুল।

সিপিআই আর একটা ভুল করে সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে কিছু নিন্দাসূচক মন্তব্য করে। এই মন্তব্য দেশের মানুষের আবেগকে আহত করে। অবশ্য পার্টি এ ভুল দ্রুত সংশোধন করে নেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্রকে গোপনে দেশের বাইরে যেতে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন, তাদের মধ্যে আচ্চার সিং চীন, ভগৎরাম তলোয়ার

প্রমুখ কমিউনিস্টরা ছিলেন এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে আইএনএ বন্দীদের মুক্তির দাবিতে কমিউনিস্টরা সোচ্চার থাকেন।

বিশ শতকের চারের দশকে 'পাকিস্তান'এর দাবি যখন উত্থাপিত হয়, 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' হাজির হয়, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে দরকষাকষি চলতে থাকে, তখন ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পরিষ্কার ও স্পষ্ট অবস্থান নিতে পারেনি। ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ই এম এস নাম্বুদিরিপাদের মতে, ''স্বাধীনতার আন্দোলনে যে সব কর্মী ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, যাঁরা আপস রফা করার বিরোধী, তাঁদের মনোবলকে সুদৃঢ় করে তুলে, তাঁদের সবাইকে একসঙ্গে টেনে এনে মিলিত করে কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের দর কষাকষির রাজনীতিটার স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়া—এই কাজটা করতে পারেনি পার্টি। সামনের কয়েক বছরের ভেতরেই রাজনৈতিক গগনে যে ঘোর ঘনঘটা সমাপন্ন, সে সম্বন্ধেও পার্টি জনগণকে আগে থেকেই যথেষ্ট সতর্ক করে দিতে পারেনি।'' (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস) তবে সংকীর্ণ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সিপিআই দাঁড়াতে পেরেছিল বলেই পরবর্তীকালে কয়েকটা বড় বড় আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল।''

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এটা এখন স্বীকৃত যে বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে একটা নতুন ধারা সংযোজিত হয়—কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিই প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলে। স্বাধীনতার পর খাদ্যের দাবিতে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দাবিতে, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধে, ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন তো ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। আন্দোলনের ফলেই বাংলা-বিহার সংযুক্তিকরণ আটকানো গেছে। জমি, মজুরি, ছাঁটাই, লে অফ, লকআউট নিয়ে শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম হয়েছে। দাবি হিসেবে উঠে এসেছে মৌলিক ভূমিসংস্কার, শিল্প জাতীয়করণ।

সংসদীয় নির্বাচনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সাফল্য দেখিয়েছে। ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান বিরোধী দল হয়েছে (৪৮৯টা আসনের মধ্যে ১৬টা)। ১৯৫৭ সালে ৪৯৪টা আসনের মধ্যে ২৭টা, ১৯৬২ সালে ৪৯৪টার মধ্যে ২৯টি। প্রাপ্ত ভোট (শতাংশে) : ১৯৫২ – ৩.২৯, ১৯৫৭ – ৮.৯২, ১৯৬২ – ৯.৯৪। ১৯৫৭ সালে কেরালায় বিধানসভা নির্বাচনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এককভাবে সরকার গঠন করে। মুখ্যমন্ত্রী ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ। ১৯৫৯ সালে সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে এই সরকার ভেঙে দেয় কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ২৮ মাসের মাথায়। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম অকংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়। ফ্রন্টের সবচেয়ে বড় শরিক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। ৯ মাসের বেশি এই সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করতে দেয়নি। আবার ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়। এই সরকারকেও ১৩ মাসের বেশি স্থায়ী হতে দেওয়া হয়নি। ''কিন্তু সেই স্বল্প সময়সীমার মধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল জমির লড়াই, মজুরির লড়াই। সব অংশের মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারিত করার লড়াই।'' (বামফ্রন্ট সরকার :

একটি পর্যালোচনা, পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ২৪তম সম্মেলন) বিধানসভা নির্বাচনে পার্টির প্রাপ্ত আসন (মোট আসন ২৮০) : ১৯৬৭-৪৩ (সংযুক্ত বামফ্রন্ট ৬৮), ১৯৬৯-৮০ (যুক্তফ্রন্ট ২১৪), ১৯৭১-১১১+২ (সমর্থিত)=১১৩ (নির্বাচন ২৭৭) (সংযুক্ত বামফ্রন্ট ১২৩)। বিধানসভায় দ্বিতীয় বৃহৎ দল থেকে ক্রমশ বৃহত্তম দল। কিন্তু ১৯৭১ সালে পার্টিকে সরকার গড়তে দেওয়া হয়নি। আর ১৯৭২ সালের নির্বাচন তো ছিল প্রহসন। আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস, জরুরী অবস্থা। গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম। ১৯৭৭ সালে নির্বাচন। কংগ্রেসের পরাজয়। কেন্দ্রে জনতা পার্টির সরকার। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার। বৃহত্তম শরিক সিপিআই(এম)। প্রাপ্ত আসন (মোট আসন ২৯৪)-১৭৮ (বামফ্রন্ট ২৩১)। এইভাবে ১৯৭৭-২০১১ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার। একটানা প্রায় সাড়ে ২৩ বছর জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী। বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে পূর্বোক্ত দলিল–''বামফ্রন্ট সরকারের পর্যালোচনার অন্তর্নিহিত বিষয় হল ২২ মাসে দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়টা বাদ দিলে ১৯৪৭-৭৭ এই তিরিশ বছরের শেষে পশ্চিমবাংলা কোন অবস্থায় ছিল এবং ২০১১ সালের পর এপর্যন্ত কি অবস্থায় আছে তার সঙ্গে একটা তুলনামূলক বিচার। এই ৩৪ বছরের সাফল্য পর্বতপ্রমাণ সমস্যা ও ব্যর্থতাগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে রাজ্যের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একটি উন্নততর সময়োপযোগী বাম বিকল্পের অনুসন্ধান করা এবং যথাসময়ে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ জনগণের সামনে হাজির করা।''

১৯৭৮ সালে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। বৃহত্তম শরিক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, কেরালাতে এখন ধারাবাহিকভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-কে সবচেয়ে বড় শরিক করে বামফ্রন্ট কিংবা বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হচ্ছে। এই ফ্রন্ট সরকার গঠন করছে। সর্বভারতীয় স্তরে প্রকৃত বিকল্প হিসাবে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার উদ্যোগ চলছে।

সাংগঠনিক প্লেনাম

সংগঠন ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি নিষ্ক্রিয়। সংগঠন বলতে শ্রমিকশ্রেণির অগ্রণী বাহিনীর বিপ্লবী পার্টি। সংগঠন নিয়ে পার্টিতে নিয়মিত চর্চা করতে হয়, সবলতা-দুর্বলতা পর্যালোচনা করতে হয়। প্রতি পার্টি কংগ্রেসে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট গ্রহণ করতে হয়। এই রিপোর্টে পার্টি সংগঠন থাকে, গণসংগঠন থাকে এবং বিস্তৃতভাবে। এইভাবে সংগঠন নিয়ে পর্যালোচনা ছাড়াও পার্টি দুটো সাংগঠনিক প্লেনাম করেছে। একটা সালকিয়ায় ১৯৭৮ সালের ২৭-৩১ ডিসেম্বর, আর একটা কলকাতায় ২০১৫ সালের ২৭-৩১ ডিসেম্বর। মাঝে পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস সালকিয়া প্লেনামের নির্দেশাবলী কার্যকর করার অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করে। পার্টির মর্যাদা ও প্রভাব যখন ক্রমবর্ধমান, তখন সালকিয়া প্লেনাম গণবিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার দায়িত্ব নেয়। সেই গণবিপ্লবী পার্টি অবশ্য গড়ে তোলা যায়নি। আবার পরবর্তীকালে পার্টির গণভিত্তি ক্ষয় পেতে থাকে।

২০১৫ সালে প্লেনাম হয়েছে। দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে

জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির কিছুটা বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে। তাই এখন জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। আন্দোলন-সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রসারিত করতে হবে। যেমন বস্তিবাসীদের তো সংগঠিত করতেই হবে, বহুতলবাসীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে হবে। পার্টির সাংগঠনিক কাঠামোর সকল স্তরে সময়ভিত্তিক কাজের পর্যালোচনা করতে হবে। পার্টি পরিচালনায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতে হবে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণসংগঠন পরিচালনায় নজর রাখতে হবে, নতুন নতুন সংগঠন/সংস্থা/মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে।

প্লেনামের আহ্বান

আমরা আত্মবিশ্বাসী, আমরা দায়বদ্ধ। প্লেনাম তাই নির্দেশ দিয়েছে, ''তবে সিপিআই(এম)-র এই দিশা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সাংগঠনিক সামর্থ্যকে মস্তবড়ো আকারে বাড়ানো দরকার। বিপ্লবী পার্টি হিসেবে আমরা ভারতের স্বাধীনতা ও একটি জনমুখী সমাজতান্ত্রিক বিকল্পের জন্য পার্টির সংগ্রামের গৌরবজনক ঐতিহ্যের উত্তরসুরী। আন্তর্জাতিক স্তরে ও দেশের অভ্যন্তরে বৈপ্লবিক আন্দোলনে সব ধরনের মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্যের সঙ্গে জয়লাভের ঐতিহ্যেরও আমরা উত্তরসূরি।'' তাই প্লেনাম যে দায়িত্ব আমাদের দিয়েছে, তা হচ্ছে, ''সকল শোষিতশ্রেণির বিপুল সংখ্যক মানুষ শোষণকারী শাসকশ্রেণিগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে রুখে না দাঁড়ালে কোনো সামাজিক রূপান্তরই সম্ভব নয়, বস্তুতপক্ষে তা অভাবনীয়। চূড়ান্ত বিচারে ইতিহাস রচনা করেন জনগণই। বৈপ্লবিক ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়। বৈপ্লবিক দল হিসেবে সিপিআই(এম) এই গণঅভ্যুত্থানের অগ্রণী বাহিনী হিসেবে অবতীর্ণ হবেই। এ আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব।'' এখন আমাদের সর্বভারতীয় গণভিত্তিসম্পন্ন সিপিআই(এম) গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে যেতে হবে। গণ লাইনসম্পন্ন বিপ্লবী পার্টি গঠনে সামনে পা ফেলতে হবে।

সাহায্যকারী পুস্তক-পুস্তিকা

১. ভারত প্রসঙ্গে লেনিন – ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
২. বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন – দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য (৫ খণ্ড)–ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
৩. আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি – মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
৪. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস – ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ
৫. তেলঙ্গানার গণসংগ্রাম ও তার শিক্ষা – পি সুন্দরাইয়া
৬. অরুণ সৌরির কমিউনিস্ট বিরোধী কুৎসার জবাব – এম বাসবপুন্নাইয়া
৭. বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান (১৫ খণ্ড) – মঞ্জু কুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত সম্পাদিত
৮. ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-২০০০) – সুকোমল সেন

৯. ভাড়াটিয়া মসিজীবীর কমিউনিস্টবিরোধী, সোভিয়েতবিরোধী কুৎসার জবাব – গৌতম চট্টোপাধ্যায়
১০. অসমাপ্ত বিপ্লব অপূর্ণ আকাঙ্খা/ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস – নরহরি কবিরাজ সম্পাদিত
১১. স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত ও অবিভক্ত বাঙলার কমিউনিস্ট আন্দোলন (১৯২০-৪১) – সুস্নাত দাশ
১২. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম – সুপ্রকাশ রায়
১৩. নৌ বিদ্রোহের ইতিহাস – ফণিভূষণ ভট্টাচার্য
১৪. উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব – অমলেন্দু সেনগুপ্ত
১৫. Karl Marx on India ¬¬– Edited By Eqbal Husain
১৬. Karl Marx Federick Engels On the National and Colonial Questions – Edited by Aijaz Ahmad
১৭. History of the Communist Movement in India (Vol. 1) – Communist Party of India (Marxist)
১৮. Documents of the Communist Movement in India (26 Vols.)
১৯. Communists Challenge Imperialism from the Dock – National Book Agency Pvt. Ltd.
২০. India To-day – R Palme Dutt
২১. The Independence Struggle and After – B T Randive
২২. March of the Communist Movement in India – Harkishan Singh Surjeet
২৩. The Role of the Communists in India's Struggle of Freedom – P Ramamoorthy
২৪. A History of the All India Kisan Sabha – M A Rasul
২৫. Documents of the History of the Communist Party Of India (Vols.1, III A-C, VII, VIII) – Edited by G. Adhikari and others
২৬. Communism in India (3 Vols.) – Edited by Subodh Roy
২৭. The Seed – Time of Communist Movement in India (1999-26) – Edited by Ladlimohan Raychoudhury
২৮. India and Communism (Secret British Documents) – Edited by Ashok Mukherjee
২৯. Comintern and the Destiny of Communism in India 1919-1943 – Sobhanlal Datta Gupta